ক্যাম্পে বন্দি থাকা বীরাঙ্গনাদের দিনগুলো

ক্যাম্পে বন্দি থাকা বীরাঙ্গনাদের দিনগুলো

সুরমা জাহিদ

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
প্রণব রায়

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

Campe Bondi Thaka Birangonader Dingulo by **Surma Zahid**
Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2024

Price : 400.00
US $ 10

ISBN 978 984 98480 6 6

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
www.anindyaprokash.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৫৭১১১৯৬৬৬
www.rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
www.othoba.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
www.boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
www.prothoma.com/publisher/অনিন্দ্য-প্রকাশ ফোনে অর্ডার করতে ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩
www.boiferry.com/publisher/anindya-prokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬৩৮১১২১১২

উ ৎ স র্গ

শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান স্যার

মুক্তিযুদ্ধ ও বীরাঙ্গনা বিষয়ক গবেষণায় সুরমা জাহিদের প্রকাশিত বই :

বীরাঙ্গনা সমগ্র-(১-৫) খণ্ড
বীরাঙ্গনাদের কথা
একাত্তরে নির্যাতিত নারীদের ইতিহাস
১৯৭১ সালে সম্ভ্রম হারানো নারীদের করুন কাহিনি
এই সংগ্রামে আমিও আদিবাসী বীরাঙ্গনা
সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বদেশ
একাত্তরের যুদ্ধে নির্যাতিত নারী
একাত্তরের বীরমাতাদের অজানা কথা
Memoirs of War Victims
আমরা যুদ্ধশিশু
বহির্বিশ্বে গণ মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
নিষিদ্ধ-অনিষিদ্ধ
কিশোরীদের দেখা মুক্তিযুদ্ধ
নির্যাতিত শৈশব
বহির্বিশ্বে গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ
বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বঙ্গবন্ধু
বীর নারী মুক্তিযোদ্ধার কথা
মুক্তিযুদ্ধে ৫০ বীর মুক্তিযোদ্ধা
মুক্তিযুদ্ধে বীর নারী
কিশোরীদের দেখা একাত্তরের ভয়াবহ স্মৃতি
আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি, একাত্তর এবং আমরা
১৯৭১ পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালি
We The War Babies
The Anguish of Oppressed Women in 1971

কবিতা : অন্যরকম চাওয়া, অবরোধের অধিকার, মুক্তিযুদ্ধ এবং একটি প্রেমের গল্প।
উপন্যাস : খন্ডক, আজ বসন্তের দিন, সোনার পালঙ্কে আমি একা।
ছোটগল্প : না! আর যাব না।
ভ্রমণ : দেখে এলাম সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকার গল্প।

ভূমিকা

বীরত্ব আর বেদনায় ভরা বাঙালির জীবনে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম গৌরবময় উজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম মুক্তিযুদ্ধ। এ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়-রক্ত আর অশ্রুতে সিক্ত। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ গৌরবের কালজয়ী এক স্বর্ণালী অধ্যায়। এই যুদ্ধের ভেতর দিয়ে বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজন্ম লালিত কাঙ্ক্ষিত এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ। এই জনযুদ্ধে বাঙালি নারীরাও অংশগ্রহণ করেছেন। পুরুষের পাশাপাশি যেমন সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে মুক্তিযুদ্ধের তথ্যাদি গোপনে সংগ্রহ করে তা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদান করে সহযোগিতাও করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে প্রণোদনা প্রদান, অস্ত্রের যোগান দেওয়া, অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান, অন্ন-বস্ত্রের যোগান দেওয়া, রান্না করে মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ানোসহ সকল ক্ষেত্রেই এই বাঙালি নারীগণ এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন।

এসমস্ত কাজ করতে গিয়ে অনেক বাঙালি বীর নারী বিভিন্নভাবে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নৃশংস পাশবিক নির্যাতন ও বহুমাত্রিক অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। আবার অনেকেই এই নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়েও পড়েছেন। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় দোসর-রাজাকারসহ স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির লোকজনের অমানবিক, অমানুষিক, অকল্পনীয়, পাশবিক, নির্মম, নিষ্ঠুর নির্যাতন, ধর্ষণের শিকার হয়েছে বাংলার নারীরা-যাদেরকে বীরাঙ্গনা-বীরমাতা হিসেবে আখ্যায়িত করে সর্বশেষে রাষ্ট্রীয়ভাবে বীর নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ আমাদের এই বীরাঙ্গনা-বীরমাতা-বীর নারী মুক্তিযোদ্ধাগণ-যাদের বাদ দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁদের এই চরম আত্মত্যাগ বাংলাদেশের স্বাধীনতার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

এক সময় মনে হলো– তাঁদের তথ্যাদি যদি তাদের জীবদ্দশাতে সংগৃহীত, লিপিবদ্ধ ও যথাযথভাবে সংরক্ষিত না হয়, তবে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে- যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি অজানা-অনাবিষ্কৃত অধ্যায় হিসেবে রয়ে যাবে এবং এক সময় ইতিহাসের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে। সারা বিশ্ব জানতে পারবে না, বাংলার মা-বোনদের উপর পাক হানাদার বাহিনীর এমন নৃশংস, অবর্ণনীয়, পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা; কী চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

তাই বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে সেইসব বীরমাতা-বীর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের করুণ কাহিনির তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ শুরু করি ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে। এক পর্যায়ে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রয়াত ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাহাত খানের সহযোগিতা নেওয়া হয়। কিন্তু এভাবেও কাজটি করা বেশিদিন সম্ভব হয়নি।

তারপর আমার স্বামী মৎস্য অধিদপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সহায়তায় সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেয়ে যেয়ে তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ শুরু করি। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, বিশিষ্ট জন, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় কোনো প্রকার আর্থিক সহযোগিতা ব্যতীত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ২৬/২৭ বছর যাবৎ বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায় এই বীরমাতা-বীর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের নারকীয় পৈশাচিক করুণ কাহিনির তথ্যাদি সংগ্রহ করে, সেই অসম্পূর্ণ কাজটি এককভাবে করে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অংশ হতে পারায় নিজেকে গৌরবান্বিত ও ধন্য মনে করছি।

শুরুর দিকে বীরমাতাদের তথ্যাদি সংগ্রহ করা খুবই দুরূহ ও কঠিন কাজ ছিল। বহু ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এ কাজটি করতে হয়েছে। সেইসব বীরমাতারা কথা বলতে, মুখ খুলতে চাইতেন না। তাঁদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, হচ্ছে এবং আরো হতে পারে– এই ভেবে। স্থানীয় লোকজনের অনেকেই তাঁদের সম্পর্কে অশালীন, আপত্তিকর, আজেবাজে ও বিশ্রী মন্তব্য করেছে, যা তাঁরা নীরবে সহ্য করেছেন। এমনকি স্থানীয়ভাবে তাঁদেরকে কোনো কাজ করার সুযোগও দেওয়া হয়নি, সমাজে তাঁদেরকে স্থান দেওয়া হয়নি, অনেক সময় তাঁদেরকে সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখা হয়েছে। বহু কৌশল অবলম্বন করে, কখনো একজন বীরমাতার সন্ধান পেয়ে তাঁর তথ্যাদি সংগ্রহ করতে ৬ মাস এমনকি এক বছর সময়ও লেগেছে। এমনও হয়েছে যে, একজনের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ওই এলাকায় ৪/৫ দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে হয়েছে। লোকালয় ছেড়ে দূরে নির্জন জায়গায়, হাওর, পাহাড়, জঙ্গলে, এমনকি রাতের অন্ধকারেও কুপি বাতি জ্বালিয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় ২/৩ বারও যেতে হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে নানারকম বড়ো বড়ো বিপদ ও ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তখন পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে বুদ্ধি-বিবেচনা-কৌশল ও স্থানীয় তথ্যদাতার সহযোগিতায় এ সমস্ত বিপদ ও ঝুঁকি থেকে নিজেকে রক্ষা করে কাজটি সম্পন্ন করেছি। এমনও অনেক নারী ছিলেন যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সমাজ এই সমস্ত বীরমাতাদের নিগৃহীত করায়, ঘৃণার চোখে দেখায় তাঁরা নিজেদেরকে প্রকাশ করেননি।

অনেক সময় আঞ্চলিকতার কারণে তাঁদের ভাষা বোঝা যায়নি, তখন তাদের তথ্য রেকর্ড করে পরে দোভাষীর সহায়তায় লেখা হয়েছে। এমনটি হয়েছে বিশেষত পার্বত্য অঞ্চল, কক্সবাজার, সিলেট অঞ্চল ও উত্তরবঙ্গে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংস নির্যাতনের বর্ণনা শুনতে এবং লিখতে আমার ভেতরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরেছে। তাঁদের সেই নির্যাতন ও দুঃসহ যন্ত্রণার কথা আমি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাঁদের সেই রক্ত ভেজা দুর্বিষহ

স্মৃতিগুলো যখন শুনতাম, তখন এগুলো বিশ্বাস করতে কষ্ট হতো। আমার কানকে বিশ্বাস করাতে পারতাম না। তাঁদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা আমি খুঁজে পেতাম না। আমি আমার মাঝ থেকে অন্য কোথাও হারিয়ে যেতাম। উপলব্ধি করতে পারতাম তাদের যন্ত্রণা। সেইসব ত্যাগী নারীদেরকে খুঁজে বের করতে আমি মাঠে নেমে গিয়েছি। সহযোগিতা চেয়েছি সমস্ত বাংলাদেশের সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, এলাকার প্রবীণ-গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সুশীল সমাজের। পরিচিত অপরিচিত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতা চেয়েছি এবং পেয়েছি। তাদের সহযোগিতা না পেলে এ কাজটি করা খুব বেশি কঠিন হয়ে যেতো। যদিও এ কাজটি করতে আমার অনেক বেশি কষ্ট হয়েছে।

অনেক বড়ো পরিসরে কাজটি করতে গিয়ে প্রায়শই প্রায় সব জায়গা থেকেই নানানভাবে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কোথাও কোথাও আংশিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে চলে আসতে হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও প্রথমবার তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তারপরও আমি চুপ করে বসে না থেকে তাদের বাধাকে অতিক্রম করি। যারা এ কাজে বাধা দিয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলে, আলোচনা করে, তাদেরকে বুঝিয়ে এবং পরবর্তীতে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এ কাজটি করতে অর্থাৎ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে সক্ষম হতে পেরে আমি অনেক আনন্দ বোধ করেছি।

জামালপুরের বীরমাতা জুলেখা বেগম বলেছিলেন, আমি কোনো পাপ না করেও সমাজের চোখে আমি পাপী। কোনো অন্যায় করিনি, তারপরও পেটের ছেলে আমার মুখ দেখে না। কারণ, আমি কলঙ্কিত, আমার চরিত্র ভালো না, আমার চরিত্রে কালো দাগ লেগেছে। আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। কিন্তু আমার ভাসুরের ছেলে তার একটা ভাঙা ঘরে আমাকে থাকতে দিয়েছে। আমি ঐ ঘরে থাকি। চলাফেরার মাঝে যখন ছেলের সাথে দেখা হয়ে যায় তখন সে খুব খারাপ ভাষায় আমাকে বকাবকি করে। তাই আমি সবসময় দূরে দূরে থাকি। যখন ছেলেকে দেখতে খুব বেশি মনে চায় তখন গাছের আড়াল বা এখানে সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে একনজর তাকে দেখে দূরে সরে যাই। মা তো, মনকে মানাতে পারি না। আমি জানি, আমি কোনো পাপ করিনি। আমার স্বামীকে গুলি করে মেরে তার রক্তের ওপর ফেলে পাক হানাদার বাহিনীরা আমার মান-ইজ্জত নষ্ট করেছে, তা গ্রামের অনেকেই দেখেছে। আমি মরার আগে আমার ছেলেকে একবার ধরে তাকে আদর করে মরতে চাই। আমি আবারও বলছি, আমি কোনো পাপ করিনি। আমার মরণ যেন হয় হাসি মুখে। পৃথিবীতে যত দুঃখ বেদনায় সারা জীবন কেটেছে, মৃত্যুর পরে যেন কোনো দুঃখ বেদনা আমাকে স্পর্শ করতে না পারে-এই কামনা করি। সকলের কাছে এটুকুই চাই।

একজন বীরাঙ্গনা- বীর মাতা- বীর নারী মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলতে গিয়ে আমাকে কথা বলতে হয়েছে তাঁর বাড়ির সকলের সাথে, পাড়াপ্রতিবেশীসহ গ্রামের অনেক লোকের সঙ্গে। তাদের অনেকের অনেক কিছু জানার ছিল, যা তারা আমার নিকট থেকে জেনে নিয়েছে।

সেইসব বীর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের করুণ মর্মন্তুদ ঘটনা শুনতে শুনতে মনে হতো আমিও বুঝি সেই রণাঙ্গনে আছি। তাদের চোখ বেয়ে বেয়ে পানি পড়ে যেমনিভাবে আঁচল ভিজে যেতো, ঠিক তেমনিভাবে তখন আমার ভেতরে রক্তক্ষরণ হতো– কিন্তু তা আমি তাদেরকে বুঝাতাম না। চোখে পানি এলে ঘন ঘন চোখের পানি নিয়ন্ত্রণ করেছি। কিন্তু যখন লিখতাম তখন আর নিজেকে একেবারেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতাম না।

এমনও হয়েছে যে, একজনের তথ্য সংগ্রহ শেষ করে যখন লিপিবদ্ধ করতে যাচ্ছি, তখন শিউরে উঠেছি। সারা শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠতো, ঘুমের মাঝেও এই ঘটনা ভেসে আসতো। কয়েকদিন স্বাভাবিক থাকতে পারতাম না।

পুরনো সহিংসতা, নির্যাতনের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা নতুন করে বর্ণনা করা তাঁদের পক্ষে খুব বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে চরম প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে বহু সংগ্রামের পর অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে, কষ্টগুলো বুকে চেপে ধরে নীরবে নিভৃতে বেঁচে আছেন তাঁরা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সমাজ, দেশ, সংসার এমনকি ইতিহাস থেকেও সেইসব বীর বাঙালি নারীরা হারিয়ে গিয়েছে। চেষ্টা করেছি, কীভাবে তাঁরা সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং কীভাবে সমাজে টিকে আছেন– তা উপস্থাপন করতে। ইতিহাসের সেই অনাবিষ্কৃত, অকথিত, অনিবন্ধিত কাহিনি আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায়।

যারা নিজেদের জীবন, মান-সম্মান-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে আমাদেরকে এই দেশটা স্বাধীন করে দিয়েছে, তাদের রক্তে ভেজা পৈশাচিক নির্যাতনের করুণ স্মৃতিসমূহ এই গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বীরাঙ্গনাদের তথ্যাদি সংগ্রহের এ কাজের ধারাবাহিকতায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় সর্বশেষে সদাশয় সরকার বিশেষ করে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযুদ্ধকালীন চরম আত্মত্যাগকারী এই বীরাঙ্গনাগণকে বীর নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সমাজে সুন্দর সামাজিক অবস্থান নিশ্চিতকরণে নানাবিধ বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ও নিরলসভাবে তা বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

বীরাঙ্গনাগণ বীর নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির ফলে তাঁরা নিজেদেরকে জাগরিত করে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছেন– যা দেখে বাংলার অন্য নারীরাও তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজে পুরুষের পাশাপাশি সমানতালে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

গাজীপুর অবস্থানকালীন সময়ে যিনি বীরাঙ্গনাদের তথ্যাদি সংগ্রহে সার্বিক সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন তিনি আলহাজ্ব এডভোকেট আ ক ম মোজাম্মেল হক এম পি, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

কৃতজ্ঞতা প্রয়াত প্রফেসর এমিরেটাস ড. আনিসুজ্জামান স্যারকে, যিনি গভীর মমতায় স্নেহ দিয়ে এ কাজে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাহস জুগিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, ড. হারুণ-অর রশিদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিন মিয়া, মুক্তিযুদ্ধকালীন ৩ নং সেক্টর কমান্ডার ও সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ বীর উত্তম পিএসসি (অব.) সহ তার সহধর্মিনী সাইদা আক্তার-এর প্রতি।

আমার খুব প্রিয় ও ভালো লাগার একজন– ছিদ্দিকা জামান বেবী ভাবি, যিনি সার্বক্ষণিকভাবে বীরাঙ্গনাদের তথ্য সংগ্রহসহ সার্বিকভাবে উৎসাহ দিয়েছেন; এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী ও তাঁদের এ দেশীয় দোসরদের দ্বারা নির্যাতিত নিপীড়িত বীরাঙ্গনাদের পাশবিক নির্যাতনের করুণ তথ্য সংগ্রহে একান্ত আপন ভেবে অন্তর থেকে যারা সহযোগিতা করেছেন- তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই শিশুকালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত জনাব মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠানকে- যিনি আমাকে সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. সৈয়দ আরিফ আজাদ বীরাঙ্গনাদের তথ্য সংগ্রহে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন– তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও আমার জীবনসাথির চাকরির সুবাদে মৎস্য অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, যারা তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তরিকতার সাথে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ– তাঁদের মধ্যে রয়েছেন উপপরিচালক মোহাঃ বজলুর রশীদ, উপপরিচালক মোঃ সফিকুর রহমান, উপপরিচালক মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, উপপরিচালক সুলতান আহমেদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক ছালেহ আহমেদ, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ এমদাদুল হক, আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, হরেন্দ্রনাথ সরকার, বঙ্কিম চন্দ্র বিশ্বাস, রেজাউল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ লতিফুর রহমান, মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ শহিদুল ইসলাম, মোঃ আঃ জলিল, শরৎ কুমার ত্রিপুরা, প্রিয় কান্তি চাকমা, অবর্ণা চাকমা, প্রবীর কুমার চাকমা, উচিৎময় চাকমা, মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা গোলাম জিলানীসহ আরও অনেকে। এছাড়াও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি কবি ও সাহিত্যিক জনাব মোশাররফ হোসেন ভূঁঞা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী আবেদ লতিফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান সরকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইদ্রিস আলী বীর প্রতীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নজরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোহাম্মদ আলী পাঠান, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আলী হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা খলিলুর রহমান খলিল, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার পরিমল বড়ুয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা

কমান্ডার বাদল ব্যানার্জী, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার পরিমল সিং, হাবিলদার (অব.) মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক নুর মোহাম্মদ, পৌর মেয়র আনিছুর রহমান, চেয়ারম্যান আমিরুল হক, অধ্যাপক সরোয়ার হায়াৎ খান, লেখক এম এ গণি আকন্দ, সাংবাদিক মানিক সাহা, সাংবাদিক মোঃ ইকবাল কবির, সাংবাদিক নুরুল আমিন সিকদার, সাংবাদিক আজম খান, সাংবাদিক দেলোয়ার হোসেন, সাংবাদিক নিমাই ধর, সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, সাংবাদিক জিল্লুর রহমান পলাশ, সাংবাদিক সং ছেন চীং, অ্যাডভোকেট এ কে নেছার উদ্দিন, অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম, অ্যাডভোকেট ফিরোজ মিঞা, অ্যাডভোকেট আলাউদ্দিন, উপসচিব মিজানুর রহমান ছিদ্দিকী, কবি মিতালী হোসেন, উন্নয়নকর্মী সাফিনা লোহানী, আনোয়ার হোসেন, আবিদ উদ্দিন চৌধুরী, মুছাদ্দিক রহমান, সোলাইমান মিয়া, মোঃ নাজির উদ্দিন, আফতাব উদ্দিন, নার্গিস পারভীন, মিজানুর রহমান, গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা, শামছুজ্জোহা, নুরজাহান বেগম, রোকেয়া বেগম, নিভা বর্মণ, মানিক বর্মণ, কমরেড আসলাম, কবি বাবলু জোয়ারদার, রাজেন্দ্র প্রসাদ বুনারজি, শিবশঙ্কর তাঁতি, পরিমল সিং বারাইক, চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, শোভা ত্রিপুরা, শ্যামসুন্দর রায়, শংকর দাস, মায়া রানি বালা, কমলা বেগম, মোঃ আব্দুল মতিন, সাব রেজিস্ট্রার আবদুল মজিদসহ আরো অনেকে– তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ব্যতিক্রমী একজন, যিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বান্দরবান জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি জনাব প্রশন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গা, যিনি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন না, যিনি এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী বীরাঙ্গনাদের তাঁর বাসায় এনে তথ্য নিতে ও ভাষান্তর করে বুঝিয়ে দিতে আমাকে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

যাদের কথা না বললেই নয়, যাদের সহযোগিতা ব্যতীত এ কাজ করা অসম্ভব ছিল, তিনি আমার সুখ-দুঃখের জীবনসাথি মো. জাহিদ হোসেন, মৎস্য অধিদপ্তরের পদস্থ সাবেক কর্মকর্তা এবং আমার দুই সন্তান, ছেলে– ব্যাংকার মোঃ নাদির হোসেন লুই ও মেয়ে– আর্কিটেক্ট নূর-এ-জান্নাত জুঁই।

সত্যিই এ কাজ, তথ্য সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করা খুবই দুরূহ। তার পরও বীরমাতাদের তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ অব্যাহত রাখতে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন এবং যারা এখনো সহযোগিতা করে চলেছেন তাঁদের সকলের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সুরমা জাহিদ
বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা।
জানুয়ারি ২০২৪।

সূচিপত্র

কানন গোমেজ	বরিশাল	১৫
বিভা রাণী	বরিশাল	২০
লাইলি বেগম (২)	বরগুনা	২৫
পারুল রানী মিস্ত্রী	বরগুনা	২৯
কমলা খাতুন	ঝালকাঠি	৩২
শুকুরন নেছা	চুয়াডাঙ্গা	৩৬
মোমেনা খাতুন	চুয়াডাঙ্গা	৪২
জাহানারা খাতুন ঈশা	মেহেরপুর	৪৮
লাইলি বেগম	মাগুরা	৫২
জরিনা বিবি	বগুড়া	৫৬
কমলা বানু	সিরাজগঞ্জ	৬২
হামিদা বানু	গাইবান্ধা	৬৮
রাবেয়া বেগম	জামালপুর	৭৩
রংমালা খাতুন	জামালপুর	৭৮
সামছুন্নাহার বেগম	জামালপুর	৮২
রেজিয়া খাতুন কমলা	কিশোরগঞ্জ	৮৭
তানিয়া খাতুন	নেত্রকোনা	৯৩
কমলা রাণী সাহা	সাভার, ঢাকা	৯৮
সুরবালা রায়	গাজীপুর	১০৪
মায়া রানী সাহা	ফরিদপুর	১১০
মনোয়ারা বেগম	ফরিদপুর	১১৪
নুরজাহান বেগম	রাজবাড়ী	১২১
রওশন আরা বেগম	গোপালগঞ্জ	১২৬
স্বর্ণলতা ফলিয়া	গোপালগঞ্জ	১৩১
মিলি বেগম (ছদ্মনাম)	গোপালগঞ্জ	১৩৬
কুসুমকুমারী ব্যানার্জী	সিলেট	১৪০
মায়া খাতুন	মৌলভীবাজার	১৪৫
প্রভারাণী মালাকার	মৌলভীবাজার	১৫১
রহিমা বেগম	ফেনী	১৫৫

কানন গোমেজ
বরিশাল

কোনোরকমে বেঁচে আছি এটুকুই বলতে পারব।

ধান-নদী-খাল এই তিনে বরিশাল। ইতিহাস ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বরিশাল। এবার আমার বরিশাল যাওয়ার পালা। সারারাত লঞ্চে করে সকালে পৌঁছালাম বরিশাল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ফ্রেশ হয়ে নাশতা সেরে, গেলাম কানন গোমেজদের বাড়িতে। তিনিও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। গিয়ে দেখি, নিজেকে খুব সুন্দর পরিপাটি করে সাজিয়েছেন। সঙ্গে তাঁর বাড়িঘরও সাজিয়েছেন। আমরা যেতেই দ্রুত হেঁটে আমাদের কাছে এলেন, বসতে দিলেন। তারপর নিয়ে এলেন বরিশালের বিখ্যাত রসে ভিজানো পাকন পিঠা। খেতে যেমন মজা দেখতেও ঠিক তেমন সুন্দর। আমরা খুব আয়েশ করে আস্তে আস্তে পিঠা খাচ্ছি। ইতোমধ্যে তাদের বাড়িতে অনেক লোক জড় হয়ে গিয়েছে। ছোটো বড়ো সকলের চোখে মুখে কৌতূহলের চিহ্ন। কেউ কিছু বলছে না। তবে একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে ইশারা ইঙ্গিতে কিছু বলছে। আমাদের পিঠা খাওয়া শেষ। তখন তথ্যদাতা কৌশলে কানন গোমেজকে ইশারায় ডেকে নিয়ে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর এসে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, পিঠা খাওয়া তো শেষ হলো, চলেন এবার যাই। আমি উঠে এলাম। তখন তথ্যদাতা বলেন, তাড়াতাড়ি হাঁটেন। না হয় সবাই ভিড় জমিয়ে ফেলবে। এসব বলে অন্য একটা বাড়ির ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলছেন, ভেতর দিয়ে দরজা আটকে কথা বলেন। বাইরেরটা আমি সামাল দিচ্ছি, যেন কেউ আপনাদের বিরক্ত না করে। আমি ভেতর দিয়ে দরজা আটকে দিয়ে কথা বলছি দু'জনে। তারই মাঝে ছোটো বাচ্চারা ধাক্কাচ্ছে। বাহিরে বসে বেড়া একটু ফাঁকা করে করে বসে আছে ভেতরে চোখ দিয়ে। দেখে মনে হচ্ছে– ভেতরে কোনো সিনেমা চলছে তাই দেখছে। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে এবং বেশ আনন্দ পাচ্ছে সিনেমা দেখে। ৫/৭ বছরের সব বাচ্চা ছিল। দেখতে বেশ ভালো লাগছে। সারা শরীর একটুও নড়াচ্ছে না, শুধু

চোখ ঘুরাচ্ছে। বাচ্চাগুলো ভেবেছে আমরা তাদেরকে দেখতে পারছি না। এর ভেতরেই আমরা কথা বলি।

আমার নাম কানন, আমাদের পদবি গোমেজ। আমরা খ্রিষ্টান। আমাদের মাঝে অনেক নিয়মকানুন আছে। সব ধর্মের মাঝেই কিছু নিয়ম কানুন থাকে।

জীবন চলছে আর দশজনের মতো। মা-বাবার সংসারে আদর স্নেহে বড়ো হয়েছি। ভালোবাসার কমতি নেই। কমতি ছিল শুধু টাকা পয়সার। টাকা পয়সা যে খুব বেশি কম, তাও না। অনেক বেশি ছিল না, চলার মতো ছিল। তখন অবশ্য আমার টাকা পয়সা কম বেশির হিসাব বা জানার প্রয়োজন ছিল না। তখন আমি উড়ন্ত দূরন্ত, রঙিন প্রজাপতির মতো উড়ছি মনে মনে। যখন যা লাগতো চাওয়া মাত্র পেয়ে যাচ্ছি। শুধু বাড়ি না, পুরো গ্রামের, এলাকার সবাই আমাকে চিনতেন, জানতেন ভালো একটা মেয়ে হিসেবে। কারণ যতই দুষ্টুমি করতাম না কেন, এমন কোনো কিছু করতাম না, যাতে অন্যের ক্ষতি হয় বরং সবসময় সব বাড়ির ভালো-মন্দ খবর থাকত আমার কাছে। বিশেষ করে গ্রামের এবাড়ি সেবাড়ির বউরা ভালো-মন্দ কথা আমার সঙ্গে বলতেন। আমি বুদ্ধি করে কৌশল খাটিয়ে চেষ্টা করতাম তাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য। বয়স্ক লোকদের প্রতি আমার আলাদা একটা দুর্বলতা ছোটো থেকেই। তাদেরকে দেখলে আমার মায়া হতো। তাই আমার ভালো লাগা থেকে তাদের সঙ্গে বসে কথা বলতাম। তাদের ভালো-মন্দের কথা শুনতাম। একটা সময় বুঝতে পারি, বয়স্করা কিছু চায় না। চায় শুধু তাদের সঙ্গে বসে কথা বলি, গল্প করি। তারপর বুঝতে পারি, আসলে তারা অনেক অসহায়। কারণ বয়স হয়ে গেলে তো তাদের কোনো কাজ থাকে না। তাদের সঙ্গে গল্প করা, কথা বলার সময় আসলে থাকে না কারো। তাই তারা বেশির ভাগ সময়ই একা একা থাকতে থাকতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তারা চায় মানুষের সঙ্গ। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতাম, গল্প করতাম। তাদের সঙ্গে গল্প করতে আমারও ভালো লাগতো। তাই গ্রামের মানুষ আমাকে একটু বেশি ভালোবাসতো। অন্যদের তুলনায় আমাকে একটু বেশি প্রাধান্য দিতো। আমারও মন মানসিকতা সেভাবেই গড়ে উঠেছে, মানুষ যখন আমাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। আমার মনে হতো আমার দায়িত্বও বেড়ে গিয়েছে দ্বিগুণ। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, আমার এই আস্থাটা আমি বেশিদিন ধরে রাখতে পারিনি। আমার প্রজাপতির ডানাটা ভেঙে দিয়েছে পাক সেনাবাহিনীরা।